ইউনিট ১৫

পাকিস্তান আমলে বাংলা (১৯৪৭-১৯৭০)

ভূমিকা

দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনের পর ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী ভারত বিভক্ত হয় এবং দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। প্রায় দেড় হাজার মাইলের ভৌগোলিক ব্যবধান এবং আলাদা বৈশিষ্ট্যের দুটি ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, লোকাচার ও জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দু অংশের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও কেবল ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রধান দুটি অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। কিন্তু ধর্মীয় ঐক্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারেনি। নতুন রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর উর্দু ভাষাভাষী পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব পাকিস্তানের (আজকের বাংলাদেশ) প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ, তাদের প্রতি শোষণ-নিপীড়ন ও বঞ্চনা এ অঞ্চলের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। জনসংখ্যার দিক হতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও উপেক্ষা জনমনে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতির ধ্বংস সাধনে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত ষড়যন্ত্রও তাদের কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় পাকিস্তান সৃষ্টির পরেই স্বাধীকারের প্রশ্নে পূর্ব-পাকিস্তানিদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। প্রথমেই সূচিত হয় ভাষা আন্দোলন। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার অধিকার। তথাপি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বোধোদয় হয়নি। তাদের অব্যাহত বৈষম্যমূলক শোষণ-নিপীড়নের পটভূমিতে ১৯৫৪ সালে যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর পর ক্রমান্বয়ে স্বাধিকার প্রশ্নে দানা বাঁধে ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন। পরিণতিতে সংঘটিত হয় ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান। পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রের ভিত কেঁপে ওঠে। এ পরিস্থিতিতে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের ভরাডুবি ঘটে।

আলোচ্য ইউনিটে পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতি, শোষণ-বঞ্চনা এবং স্বাধিকার প্রশ্নে পূর্ব-পাকিস্তানিদের আন্দোলন-সংগ্রামের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

- ➔ পাঠ ১ : ভাষা আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৫২)
- ➔ পাঠ ২ : যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন, পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন ও পরবর্তী ঘটনা
- ➔ পাঠ ৩ : পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি, আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও মৌলিক গণতন্ত্র প্রর্বতন
- ➔ পাঠ ৪ : আইয়ুব বিরোধী ছাত্র ও গণ-আন্দোলন (১৯৬১-৬৫)
- ➔ পাঠ ৫ : ১৯৬৫ সালের নির্বাচন, পাক-ভারত যুদ্ধ
- ➔ পাঠ ৬ : বাংলার (পূর্ব-পাকিস্তান) প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি
- ➔ পাঠ ৭ : ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন-১৯৬৬
- ➔ পাঠ ৮ : এগার দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান
- ➔ পাঠ ৯ : ইয়াহিয়া খানের শাসন ও ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

পাঠ-১ : ভাষা আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৫২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি ¾

☞ ভাষা আন্দোলনের সূচনা কিভাবে হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের গঠন ও এর ভূমিকার বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ একুশে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। বস্তুত এ আন্দোলন বাংলার গণমানুষকে স্বাধিকার আন্দোলনের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে। এ স্বাধিকার চেতনা কালক্রমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়।

১.১ রাষ্ট্র ভাষা বিতর্ক

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই এর রাষ্ট্র ভাষা কি হবে এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। পাকিস্তান ছিল একটি বহুভাষী রাষ্ট্র। এর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। পক্ষান্তরে মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৬ ভাগ ছিল উর্দুভাষী। এ হিসেবে বাংলা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। আর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসেবে 'বাংলার' রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীগণ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা হিসেবে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণার দাবি উপেক্ষা করা হয়।

১.২ ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়

ভাষা আন্দোলনের সূচনা

উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে সমগ্র দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অন্যায় সিদ্ধান্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায় ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান যুবকর্মী সম্মেলনে। এ সম্মেলনে দাবি করা হয় যে, পূর্ব-পাকিস্তানে শিক্ষার বাহন এবং অফিস ও আইন-আদালতের ভাষা হবে বাংলা।

রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন ও তমদ্দুন মজলিশ

১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে এ সংগঠনের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে 'পাকিস্তানে রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এটি ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা। অধ্যাপক আবুল কাসেম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন এবং আবুল মনসুর আহমদ প্রণীত এ পুস্তিকায় উর্দুর সাথে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি জানানো হয়। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার সুপারিশ করা হয়। এতে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ৬ ডিসেম্বর অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। এদিকে ভাষা আন্দোলনের সাংগঠনিক রূপ দেয়ার জন্য তমদ্দুন মজলিশ একটি 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। নূরুল হক ভূঁইয়া এ পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পরিষদ সদস্যদের ইংরেজি অথবা উর্দুতে বক্তৃতা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। এ অবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তান কংগ্রেস দলের সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষারূপে স্বীকৃতি দানের দাবি জানান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন এ দাবি প্রত্যাখ্যান করলে পূর্ব বাংলার ছাত্র-শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীমহল প্রতিবাদ মুখর হয়ে পড়ে। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ২ মার্চ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও যুব সংগঠন মিলিতভাবে

'সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। সংগ্রাম পরিষদ রাষ্ট্র ভাষার ক্ষেত্রে সরকারি ষড়যন্ত্র রোধ এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে ঢাকার রাজপথ। এসময় পুলিশী আক্রমণে বহু ছাত্র আহত হয় এবং বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ১২-১৫ মার্চ ঢাকাসহ সকল জেলায় ধর্মঘট কর্মসূচি পালিত হয়। পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের সাথে একটি ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে তিনি সংগ্রাম পরিষদের অনেকগুলো শর্ত মেনে নিলেও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার দাবি মানেন নি।

জিন্নাহর ঢাকা সফর আন্দোলনে নতুন মাত্রা

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব-পাকিস্তান সফরে ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা'। জিন্নাহর এ ঘোষণা পূর্ববাংলায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ২৪ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি জানিয়ে জিন্নাহকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের চেষ্টা ও এর প্রতিবাদ

বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এসময় সরকার আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের চেষ্টা করে। এ জঘন্য প্রচেষ্টার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে বাংলা হরফ পরিবর্তন না করার দাবি জানায়।

১.৩ ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়

লিয়াকত আলী খানের ঘোষণা ও প্রতিবাদ

১৯৪৯ সালের শেষ দিকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকা সফরে এলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ প্রদত্ত একটি মানপত্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দানের পূর্ণাঙ্গ দাবি করা হয়। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। তবে ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি গণপরিষদে ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা'। তার এ ঘোষণা পূর্ব বাংলায় প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। ফলে গণপরিষদে ভাষার প্রশ্নে আলোচনা স্থগিত হয়ে যায়।

খাজা নাজিম উদ্দিনের ঘোষণা ও ব্যাপক আন্দোলন

১৯৫০ সালের পর আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়ে। তবে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন উর্দুকেই একমাত্র 'রাষ্ট্র ভাষা' হিসেবে ঘোষণা করায় পুনরায় আন্দোলন গতিবেগ লাভ করে। পূর্ববাংলার বিক্ষুব্ধ জনতা নাজিম উদ্দিনের ঘোষণার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ধর্মঘট ও হরতাল কর্মসূচি গ্রহণ করে। 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে পুনরায় মুখরিত হয় রাজপথ। ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৪ ফেব্রুয়ারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাঙালির আত্মদান

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশন ছিল। রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঐ দিন রাষ্ট্র ভাষা দিবস পালনসহ সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এবার ভয় পায় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩ টায় ১৪৪ ধারা জারি এবং মিছিল ও জনসভা নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় মিলিত হয়। তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল সহকারে অধিবেশনরত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের দিকে অগ্রসর হয়। ছাত্রদের মিছিল বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পৌঁছলে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। এতে ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। এক পর্যায়ে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে জব্বার, রফিক, সালাম, বরকত শহীদ হন। কয়েকজন ছাত্রীসহ আরো অনেকেই আহত হন।

২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা সারাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পরে। প্রাদেশিক পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন ত্যাগ করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি ঘটনার প্রতিবাদে একটি বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। এতে পুনরায় পুলিশ গুলি চালালে শফিউর সহ কয়েকজন শহীদ এবং বেশ কিছু আহত ও গ্রেপ্তার হন। ২১ ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণে যেখানে কয়েকজন শহীদ হয়েছিল সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে আজকের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মর্যাদা দান

অবিরাম ছাত্র ও গণ-আন্দোলনের মুখে নুরুল আমিন সরকার বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে গণ্য করার জন্য গণপরিষদে প্রস্তাব উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করে। ফলে ১৯৪৭ সালে সূচিত ভাষা আন্দোলন লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়।

১.৪ গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ভাষা আন্দোলন বাংলার জনগণের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি ছিল বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবিতে সংগঠিত গণ-আন্দোলন। এ আন্দোলন পূর্ব-বাংলার অধিকার বঞ্চিত মানুষকে অধিকার সচেতন ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত করে তোলে। আর এ চেতনাই পরবর্তীকালে প্রতিটি গণ-আন্দোলনে প্রেরণা যোগায় এবং জনগণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে সুগম করে স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ স্বীকৃতি আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

সার-সংক্ষেপ

ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের প্রথম এবং প্রধান ঘটনা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করতে তৎপর হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানি শাসকদের এ অপতৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য এদেশের ছাত্র-জনতা চূড়ান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্য আত্মদানের মাধ্যমে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য নজীর সৃষ্টি করে। এ সাফল্য তাদের নব চেতনায় উজ্জীবিত করে যা পরবর্তীতে স্বাধিকার অর্জনের সফল আন্দোলনে প্রেরণা যোগায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ 'বাংলা' ভাষাভাষী ছিলেন–

ক. শতকরা ৪০ ভাগ
খ. শতকরা ৫০ ভাগ
গ. শতকরা ৫৫ ভাগ
ঘ. শতকরা ৫৬ ভাগ

২. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার প্রথম দাবি জানায়–

ক. পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সংসদ
খ. পাকিস্তান সাহিত্য পরিষদ
গ. তমদ্দুন মজলিশ
ঘ. গণতান্ত্রিক যুবলীগ

৩. 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা' কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কে এই ঘোষণা দেন?

ক. চৌধুরী খালেকুজ্জামান
খ. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ. লিয়াকত আলী খান
ঘ. নুরুল আমীন

৪. কোন প্রতিষ্ঠান ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে?

ক. বাংলা একাডেমী
খ. ইউনিসেফ
গ. ইউনেস্কো
ঘ. ও. আই. সি

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা _____ ভাগ মাত্র ছিল উর্দু ভাষাভাষী।
২. মুখ্যমন্ত্রী _____ ২০ ফেব্রুয়ারি _____ ধারা জারি করেন।
৩. ____ সালে বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকে _____ রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. উর্দু ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা।
২. তমদ্দুন মজলিশ প্রথম বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি জানায়।
৩. ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকত আলী খান।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. ভাষা আন্দোলন বিষয়ক প্রথম পুস্তিকার নাম কি?
২. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
৩. ইউনেস্কো কত সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ভাষা আন্দোলনের সূচনা কিভাবে হয়েছিল?
২. ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিশের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৩. সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও এর ভূমিকা আলোচনা করুন।
৪. ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন ।

পাঠ-২ : যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন, পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন ও পরবর্তী ঘটনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- ☞ ১৯৫৪ সালে কিভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন, নির্বাচনের ফলাফল ও তাৎপর্য আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন ও পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

পূর্ব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের ইতিহাসে যুক্তফ্রন্ট ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এই নির্বাচনেই পূর্ব বাংলার জনগণ জাতি হিসেবে নিজস্ব অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

২.১ যুক্তফ্রন্ট গঠন

মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, অগণতান্ত্রিক মনোভাব, বৈষম্য ও নির্যাতনমূলক নীতির ফলে পূর্ব-বাংলার গণমনে মুসলিম লীগ বিরোধী মনোভাব চরম আকার ধারণ করে। এসময় পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচন নিয়ে ক্ষমতাসীনদের টালবাহানায় জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অবশেষে বিক্ষুব্ধ মানুষের চাপের মুখে সরকার ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। ছাত্র সমাজ ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদগণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য চাপ দেয়। এমতাবস্হায় মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। চারটি দল নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। দলগুলো হচ্ছে- (১) আওয়ামী মুসলিম লীগ (১৯৪৯ সালে সোহ্‌রাওয়ার্দী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) (২) নেজাম-ই-ইসলামী (মাওলানা আতহার আলীর নেতৃত্বাধীন) (৩) কৃষক-শ্রমিক পার্টি (১৯৫৩ সালে শেরে বাংলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) এবং (৪) গণতন্ত্রী দল (হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন)। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা এবং নির্বাচনী ইশতেহার ছিল ২১ দফা। এ দফাগুলো ছিল নিম্নরূপ :

২.২ যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা

১. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করা
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ করা
৩. পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করা
৪. সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা
৫. পূর্ব পাকিস্তানে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা
৬. কারিগর-মোহাজিরদের কাজের ব্যবস্থা করা
৭. বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করা
৮. পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা
৯. অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা
১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা
১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা ও মন্ত্রীদের বেতন ১ হাজার টাকার বেশি না করা
১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা
১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স বাতিল করা
১৫. বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক করা
১৬. বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা
১৭. ২১ ফেব্রুয়ারি নিহত শহীদ স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ করা
১৮. ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা
১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা
২০. কোন অজুহাতেই আইন সভার মেয়াদ বৃদ্ধি না করা
২১. পরিষদের কোন সদস্য পদ খালি হলে তিন মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

১.৩ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও নির্বাচন-এর ফলাফল

২১ দফা ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকারের দলিল। এতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় । এজন্য পূর্ব বাংলার জনগণ ২১ দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। ফলে ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে এবং মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। নির্বাচনের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ :

মোট আসন সংখ্যা ৩০৯

রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
যুক্তফ্রন্ট	২৩৬
মুসলিম লীগ	০৯
কংগ্রেস	২৪
তফসিলী সম্প্রদায়	২৭
খেলাফত-ই-রাব্বানী	০১
খ্রিস্টান	০১
বৌদ্ধ	০২
কমিউনিস্ট পার্টি	০৪
নিদর্লীয়	০৫
মোট আসন সংখ্যা =	৩০৯ টি

২.৪ মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনসহ মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার ৫ জন প্রভাবশালী সদস্য এবং কয়েকজন খ্যাতিমান কেন্দ্রীয় নেতা এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হন। মুসলিম লীগের এ পরাজয়ের কতগুলো কারণ ছিল। যথা- মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতা, রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নকে সঠিকভাবে মোকাবিলায় ব্যর্থতা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবির বিরোধিতা, পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক দুর্গতি, সাধারণ জনগণ থেকে নেতৃবৃন্দের বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি।

২.৫ নির্বাচনের তাৎপর্য

১৯৫৪ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। যথা—

ক. এটি ছিল সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে প্রথম অবাধ নির্বাচন।

খ. এ নির্বাচন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং তাদের মধ্যে বিপুল রাজনৈতিক উৎসাহ-উদ্দিপনা সৃষ্টি করে।

গ. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে জোরদার করে।

ঘ. শোষিত-বঞ্চিত পূর্ব বাংলার জনমনে বিপুল আশার সঞ্চার করে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি বহুলাংশে তাদের মোহমুক্তি ঘটায়। যা ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়সহ পরবর্তীকালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতির উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

২.৬ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন

১৯৫৪ সালের ২৫ মার্চ পূর্ব বাংলার গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান যুক্তফ্রন্ট সংসদীয় দলের নেতা ফজলুল হককে সরকার গঠনের আহ্বান জানান। ফজলুল হক ৪ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এ মন্ত্রীসভার আয়ুস্কাল ছিল অত্যন্ত অল্প। তবে এ সময়ের মধ্যেই এই মন্ত্রীসভা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা এবং বর্ধমান হাউসকে বাংলা একাডেমী করার প্রস্তাব অনুমোদন করে।

২.৭ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার অবসান

যুক্তফ্রন্ট ছিল একটি নির্বাচনী মোর্চা। কোন আর্দশিক ভিত্তিতে নয় বরং নির্বাচন এবং মুসলিম লীগকে মোকাবিলার জন্যই এ মোর্চা গড়ে উঠেছিল। তাই ক্ষমতায় যাওয়ার পর নেতৃবৃন্দের মধ্যকার ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং মন্ত্রীত্ব নিয়ে বিরোধ এবং শরিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে মতানৈক্যের ফলে যুক্তফ্রন্টে বিভেদ দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন এবং মন্ত্রীসভা বাতিলের জন্য এসময় কেন্দ্রীয় সরকারও নানা তৎপরতা শুরু করে। কেননা যুক্তফ্রন্টের এ বিপুল বিজয় কেন্দ্রীয় সরকার সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। কাজেই তারা নানা অজুহাত খুঁজতে থাকে। এসময় মুখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক কলকাতা গিয়ে যে বক্তব্য রাখেন, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তার অপব্যাখ্যা করে। ফজলুল হকের বিরুদ্ধে নানা রকম কুৎসা রটানো হয়। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ এনে তাঁকে অপসারণের ষড়যন্ত্র করা হয়। একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকার সুপরিকল্পিতভাবে আদমজীনগর ও চন্দ্রঘোনাসহ দেশের নানা স্থানে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাধায়। এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে সরকার ফ্রন্ট মন্ত্রীসভার উপর এর দায় চাপিয়ে দেয়। শেষে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করা হয়।

২.৮ বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিলের পর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২ ক ধারা অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রিয় শাসন জারি করেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করে এ.কে. ফজলুল হককে গৃহবন্দি এবং অসংখ্য যুক্তফ্রন্ট নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন চলে। ১৯৫৬ সালের মার্চে ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন।

সার-সংক্ষেপ

পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, অগণতান্ত্রিক মনোভাব এবং পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে পূর্ব বাংলার জনমনে শাসক গোষ্ঠী ও মুসলিম লীগ সম্পর্কে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলার জন্য ৪টি বিরোধী রাজনৈতিক দল নির্বাচনী মোর্চা যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। ২১ দফা কর্মসূচিকে নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে গ্রহণ করে যুক্তফ্রন্ট ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বিপুল বিজয় অর্জন করে। পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। তবে যুক্তফ্রন্টের এ বিপুল বিজয় কেন্দ্রীয় সরকার সহজভাবে মেনে নেয়নি। ফলে শুরু হয় ষড়যন্ত্র। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করে পূর্ব বাংলায় সরাসরি কেন্দ্রের শাসন জারি করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়—

ক. ১৯৫২ সালে খ. ১৯৫৩ সালে

গ. ১৯৫৪ সালে ঘ. ১৯৫৬ সালে

২। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কয়টি আসন লাভ করে?

ক. ২২০ খ. ২৪০

গ. ২৩৬ ঘ. ১৯২

৩। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন—

ক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ. এ.কে. ফজলুল হক

গ. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঘ. আবুল মনুসর আহমদ

৪। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়—

ক. ৩০ মে, ১৯৫৪ খ. ৩০ আগস্ট, ১৯৫৪

গ. ৩০ অক্টোবর, ১৯৫৪ ঘ. ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৪

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ____ টি দল নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর _____ গঠিত হয়।

২. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল _____।

৩. প্রাদেশিক পরিষদের _____ আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ _____ আসন লাভ করে।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. জামায়াত ইসলামী দলটি ছিল যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল।

২. পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯ টি।

৩. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়ার পর মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. কয়টি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল?

২. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি?

৩. ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্টের নাম কি?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. কিভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল?

২. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল আলোচনা করুন।

৩. কবে এবং কিভাবে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয়েছিল?

পাঠ-৩ : পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি, আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

☞ পাকিস্তানে কিভাবে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও তাঁর কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

৩.১ পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি

প্রথম সংবিধান ঘোষণা

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ঘোষণা করা হয়। এ সংবিধানের মাধ্যমে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র নাম ধারণ করে। পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে একত্রিত করে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নাম দেয়া হয়। সংবিধানে দুই প্রদেশের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সকল বিষয়ে সংখ্যাসাম্য নীতি স্বীকৃত হয়। বাংলা এবং উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

৩.২ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ (১৯৫৬-৫৮)

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ ইসকান্দর মির্জা পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন গণতন্ত্র বিরোধী। পাকিস্তানে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হউক তা মির্জার আদৌ পছন্দ ছিল না। তাই তিনি গণতন্ত্রের বিকাশকে ব্যহত করার সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তার অগণতান্ত্রিক আচরণে ও হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৫৬-৫৮ সালের মধ্যে কেন্দ্রে তিনটি মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানেও রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করে। যুক্তফ্রন্ট নেতৃত্বের মধ্যে রেষারেষি, আওয়ামী লীগের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সর্বোপরি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার ষড়যন্ত্র ও হস্তক্ষেপের ফলে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হয়। পূর্ব পাকিস্তানের এই রাজনৈতিক বিশৃংখলার সুযোগে প্রেসিডেন্ট মির্জা পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্টর শাসন জারি করেন। অবশ্য পরিস্থিতির চাপে দুই মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্টর শাসন প্রত্যাহার করে নেন। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়।

৩.৩ ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর মৃত্যু ও সামরিক শাসন জারি

এই সময় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সভা চলাকালে আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক লীগের সদস্যদের মধ্যে গোলযোগ বাঁধে। এক পর্যায়ে উত্তেজিত পরিষদ সদস্যগণ ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন জিনিস ছুড়তে শুরু করে। এতে তিনি আহত হন এবং পরদিন হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গণতন্ত্র বিরোধী অশুভ শক্তিগুলো প্রেসিডেন্ট মির্জার নেতৃত্বে শক্তি সঞ্চয় করে। প্রেসিডেন্ট মির্জা এ ঘটনার প্রেক্ষিতে অক্টোবর' ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খান প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত হন। দেশের শাসনতন্ত্র-আইন পরিষদ; কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা বাতিল করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। সমগ্র পাকিস্তানকে তিনটি সামরিক এলাকায় বিভক্ত করে প্রত্যেক এলাকায় একজন করে সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। জেনারেল ওমরাও খান পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক এবং জাকির হোসেনকে গভর্নর নিয়োগ করা হয়। পাকিস্তান নিরাপত্তা আইন বলে সামরিক সরকার আবুল মনসুর আহমেদ, হামিদুল হক ও শেখ মুজিবসহ পূর্ব পাকিস্তানের বহু নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

৩.৪ আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল (১৯৫৮)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা ছিলেন গণতন্ত্র বিরোধী। গণতন্ত্র ধ্বংসে তাঁর অপতৎপরতার অন্যতম সহযোগী ছিলেন প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খান । কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাসে তাঁর একান্ত পার্শ্বচর আইয়ুব খানের হাতেই তাঁর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। সামরিক শাসন জারির ২১ দিন পরেই আইয়ুব খান ইস্কান্দর মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত এবং দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন। ১৯৫৮ সালের ২৭ আক্টোবর আইয়ুব খান নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন। একই সংগে তিনি প্রধান সেনাপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে বহাল থাকেন। আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতা দখলকে অক্টোবর বিপ্লব বলে আখ্যা দেন।

৩.৫ আইয়ুব খানের কতিপয় রাজনৈতিক পদক্ষেপ

আইয়ুব খান সুচতুর রাজনীতিবিদ ছিলেন। ক্ষমতায় এসেই তিনি কতগুলো রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র হননের চেষ্টা করেন। তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং ঢালাওভাবে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। জনসমর্থন আদায়ের জন্য কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি দূর ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির পর তিনি নিজে ব্যারাকে ফিরে যাবার এবং গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। আসলে এগুলো ছিল রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি। অবশ্য জনগণ সহজেই এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে সত্যিকার জনদরদি শাসক মনে করে।

৩.৬ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ

আইয়ুব খান জনগণের কিছু আস্থা অর্জনের পর রাজনৈতিক সাফল্য অর্জনের পথে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হন। তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি হাতে নেন। ১৯৫৯ সালের ৭ আগস্ট ‘পোডো’ (PODO) এবং ‘এবডো’ (EBDO) নামক দুটি আদেশ জারি করে রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেন।

৩.৭ মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন

১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান তাঁর বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তাঁর উদ্ভাবিত পরিকল্পনা মৌলিক গণতন্ত্র নামে পরিচিত। আইয়ুব খান প্রচার করেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সংসদীয় গণতন্ত্র পাকিস্তানের স্বল্প শিক্ষিত মানুষের জন্য অনুপযোগী। তাঁর প্রবর্তিত ‘মৌলিক গণতন্ত্র’ সর্বসাধারণের উপযোগী । এতে জনগণ সহজে অংশগ্রহণ করতে পারবে। মৌলিক গণতন্ত্র কার্যকর করার জন্য তিনি পাকিস্তানের দুই অংশ থেকে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এরা ছিলেন ৫ স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনের সর্ব নিম্নস্তর ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য। এ ৮০ হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য মৌলিক গণতন্ত্রীরাই প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদসহ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একমাত্র ভোট প্রদান ক্ষমতার অধিকারী ছিল। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থাসূচক ভোটে আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সার-সংক্ষেপ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলেও এর প্রথম সংবিধান রচিত হয় ১৯৫৬ সালে। সংবিধান অনুযায়ী দেশটির নামকরণ হয় ‘পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র’। ইসকান্দর মির্জা পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। তিনি ছিলেন গণতন্ত্র বিরোধী। তাঁর ষড়যন্ত্র ও হস্তক্ষেপ এবং সর্বোপরী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতার ফলে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্র ও প্রদেশে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অস্থিতিশীল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৮ সালে ইস্কান্দর মির্জা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করে। অবশ্য মাত্র ২১ দিনের মাথায় তিনি তাঁর একান্ত সহচর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আইয়ুব খান কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। আইয়ুব খান নিজেকে প্রেসিডেন্ট, প্রধান সেনাপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে বহাল রেখে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন। পাকিস্তানের ইতিহাসে শুরু হয় এক নতুন যুগের। আইয়ুব খান বিভিন্ন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর মৌলিক গণতন্ত্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়—
ক. ১৯৫৪ সালে খ. ১৯৫৫ সালে
গ. ১৯৫৬ সালে ঘ. ১৯৫৭ সালে

২. পূর্ব বাংলার 'পূর্ব পাকিস্তান' নামকরণ করা হয়—
ক.১৯৪৭ সালে খ. ১৯৫৪ সালে
গ. ১৯৫৫ সালে ঘ. ১৯৫৬ সালে

৩. পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট—
ক. চৌধুরী খালেকুজ্জামান খ. মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জা
গ. গোলাম মুহাম্মদ ঘ. আইয়ুব খান

৪. 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রবর্তন করেন—
ক. মাওলানা ভাসানী খ. ইস্কান্দর মির্জা
গ. আইয়ুব খান ঘ. আজম খান

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ১৯৫৬ সালের সংবিধানে দুই প্রদেশের পূর্ণ আঞ্চলিক _____ এবং সকল বিষয়ে _____ নীতি গৃহীত হয়।
২. ____ এবং ___ নামক দুটি আদেশ জারি করে আইয়ুব খান রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম ও নির্বাচন নিষিদ্ধ করেন।
৩. আইয়ুব খানের উদ্ভাবিত গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা _____ নামে পরিচিত।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
২. ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন।
৩. ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে দেশটির সাংবিধানিক নামকরণ কি করা হয়েছিল?
২. ১৯৫৮ সালে কাকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছিল?
৩. কবে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হন?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
২. আইয়ুব খান কিভাবে ক্ষমতায় আসেন?
৩. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কি বুঝেন?

পাঠ-৪ : আইয়ুব বিরোধী ছাত্র ও গণ-আন্দোলন (১৯৬১-৬৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি ¾

- ☞ ১৯৬১-৬৫ সালের মধ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ ১৯৬২ সালের সংবিধান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও গণ-আন্দোলন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

৪.১ পাকিস্তানের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কয়েকটি কমিশন গঠন

১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর আইয়ুব খান দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি কমিশন গঠন করেন। এদের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক কমিশন, শিক্ষা কমিশন, ভূমি সংস্কার কমিশন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ভূমি সংস্কার ও মুসলিম পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে তিনি যে প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় দেন তা জনসমর্থন লাভ করে। কিন্তু শাসনতন্ত্র ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল কার্যক্রম জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

৪.২ আইয়ুব খানের পূর্ব পাকিস্তান সফর

নতুন শাসন পদ্ধতির প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনসমর্থন আদায়ের লক্ষে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি সমস্যা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরিকরণের প্রতিশ্রুতি দেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন জেনারেল আজম খান। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাদি সমাধানে আন্তরিক ছিলেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার কারণে তাঁর প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

৪.৩ অন্দোলনের সূচনা

১৯৬১ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম আইয়ুবী সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের জন্য দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন। এ ঘটনার পর আইয়ুব খান পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করেন। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র ও গণ-আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। আন্দোলন দমনের জন্য সরকার নিরাপত্তা অধ্যাদেশের আওতায় আবুল মনসুর আহমদ, তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ও শেখ মুজিবসহ পূর্ব পাকিস্তানের বহু নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে ।

৪.৪ ১৯৬২ সালের সংবিধান

পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র ও গণ আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে আইয়ুব খান পাকিস্তানের নতুন সংবিধান ঘোষণা করেন। এ সংবিধানটি ছিল এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক। এই সংবিধানে কেন্দ্র ও প্রদেশের আইনসভা মন্ত্রী পরিষদ ও গভর্নরের ক্ষমতাকে সংকুচিত করে প্রেসিডেন্টের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়। এতে বিচার বিভাগের ক্ষমতাও খর্ব করা হয়। ঢাকাকে নাম মাত্র দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদা দেওয়া হয়।

৪.৫ সংবিধানের প্রতিক্রিয়া

১৯৬২ সালের সংবিধানে জনগণের উপর অনাস্থা প্রকাশ পায়। জনগণের অধিকার অগ্রাহ্য করে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যক্তিস্বার্থে রচিত সংবিধানকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে শুরু হয় ব্যাপক ছাত্র ও গণ-আন্দোলন। নতুন শাসনতন্ত্র বাতিল, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রাজবন্দিদের মুক্তি-এ তিন দফা দাবিতে ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে।

৪.৬ জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ও সামরিক শাসন প্রত্যাহার

শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানে ছাত্র ও গণ-আন্দোলন চলাকালে আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। তারপরেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের একদিন পূর্বে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক মৃত্যবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে বড় ধরনের শূন্যতা দেখা দেয়। প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচন বর্জনের

ফলে আইয়ুব সমর্থক ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সহজেই নির্বাচনে জয়লাভ করেন । নির্বাচনের কিছুদিন পর ১৯৬২ সালের ৮ জুন আইয়ুব খান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন।

৪.৭ রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ও ৯ নেতার বিবৃতি

সামরিক শাসন রহিত করা হলেও এ সময় প্রেসিডেন্ট এক অধ্যাদেশ বলে জাতীয় পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক দল গঠন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দেশের এই সংকটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৬২ সালের ২৫ জুন পূর্ব পাকিস্তানের ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি আইয়ুবের শাসনতন্ত্র বাতিল করে গণপ্রতিনিধি কর্তৃক একটি স্থায়ী শাসনতন্ত্র রচনার প্রস্তাব করে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি, তাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রচেষ্টা। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ বিবৃতিকে সমর্থন করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার সোহরাওয়ার্দীকে মুক্তি দেন।

৪.৮ ৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন

পাকিস্তানের শিক্ষা সংস্কারের লক্ষে গঠিত হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রিপোর্টের প্রতিবাদে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। ছাত্ররা কমিশন রিপোর্ট বাতিল, গণমুখী ও বিজ্ঞান ভিত্তিক গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য কয়েকটি গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে স্বোচ্চার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এটাই পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সফল গণ-অভ্যুত্থান। এতে আইয়ুব খানের ক্ষমতার ভীত নড়ে ওঠে।

৪.৯ রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ছিলেন রাজনৈতিক উচ্চভিলাসী। এজন্য তিনি 'পলিটিক্যাল পার্টিজ এ্যাক্ট' বা রাজনৈতিক দলবিধি প্রবর্তন করে রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন ঘটান। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং নিজে 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' নামে একটি দল গঠন করেন। এই বিধির মাধ্যমে তিনি গণ ঐক্য ধ্বংস ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দীসহ পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম পার্টি সক্রিয় হয়। এসময় সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' (এন.ডি.এফ) নামে একটি রাজনৈতিক মোর্চা গঠন করেন। এন.ডি.এফ. গঠনের মূল উদ্দেশ্যে গণ ঐক্য সৃষ্টি, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জনস্বার্থ রক্ষা এবং জাতীয় স্বার্থ সুদৃঢ় করা। এর মূল দাবি ছিল ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনর্বহাল।

৪.১০ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন

ইতোমধ্যে আইয়ুব খান মোনায়েম খানকে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন প্রগতি ও গণতন্ত্রের বিরোধী এবং আইয়ুব খানের একান্ত দোসর। বাংলার ইতিহাসে তিনি এক ধিকৃত ব্যক্তিত্ব। তাঁর সময়ে দেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও অরাজকতা চরমে পৌঁছে। এদিকে ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে পূর্বপাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। এ সময় বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে গণ ঐক্যে ফাটল ধরে এবং এন.ডি.এফ. এ দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় শেখ মুজিবের প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। কিছুদিন পর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও পুনর্গঠন করা হয়।

সার-সংক্ষেপ

১৯৫৮ সালে ইস্কান্দর মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর অগণতান্ত্রিক ও একনায়ক সুলভ শাসনের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনা করেন। নানা রকম দমন-নীপিড়ন ও বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেও এ আন্দোলন প্রশমন করা সম্ভব হয় নি, বরং এ আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. ১৯৬১ সালে আইয়ুব খানের পূর্ব পাকিস্তান সফরের সময় সেখানকার গভর্নর ছিলেন—
ক. গোলাম মুহাম্মদ খ. আজম খান
গ. জাকির হোসেন ঘ. মোনায়েম খান

২. পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান রচিত হয়—
ক. ১৯৫৯ সালে খ. ১৯৬০ সালে
গ. ১৯৬২ সালে ঘ. ১৯৬৩ সালে

৩. 'পলিটিক্যাল পার্টিজ এ্যাক্ট' প্রবর্তন করেন—
ক. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী খ. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান
গ. মোনায়েম খান ঘ. প্রধান মন্ত্রী মুহাম্মদ আলী

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. _____ সালের ৮ জুন _____ সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন।
২. ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর ______ মৃত্যুবরণ করেন।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানে নিরাপত্তা আইনে সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করা হয়।
২. হামদুর কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা শিক্ষা আন্দোলন করেন।
৩. সোহরাওয়ার্দী 'কনভেনশন মুস্‌লিম লীগের' প্রতিষ্ঠা।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. কবে পাকিস্তানের রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়।
২. জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এন.ডি.এফ) গঠনে কোন নেতা অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।
৩. কত সালে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক মৃত্যুবরণ করেন?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-প্রশ্ন উত্তর

১. ১৯৬২ সালের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
২. ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের উপর আলোকপাত করুন।
৩. আইয়ুব খানের 'পলিটিক্যাল পার্টিজ এ্যাক্ট' প্রর্বতন ও এর প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।

পাঠ-৫ : ১৯৬৫ সালের নির্বাচন, পাক-ভারত যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি ¾

- ☞ ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৫.১ ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন

১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পরবর্তী বছরে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণা পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আইয়ুবী স্বৈরাচারের উৎখাত এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষে এ নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। ক্ষমতাসীন 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ'কে মোকাবিলা করার জন্য ৫টি বিরোধী দল একত্রিত হয়ে একটি নির্বাচনী জোট গঠন করে। এ জোটের নামকরণ করা হয় 'সম্মিলিত বিরোধী দল' সংক্ষেপে কপ (COP)। ৯ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে এ জোট প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রথমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আইয়ুব খান কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধী দলীয় জোট ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে প্রার্থী করেন। ফাতেমা জিন্নাহ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, তবে কায়েদ-ই-আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন হিসেবে তাঁর প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তাছাড়া তিনি গণতন্ত্রের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। এজন্যই তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে সম্মত হয়েছিলেন।

৫.২ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল

নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খানই বিজয়ী হন। তাঁর এ বিজয়ের মূল কারণ ছিল তাঁর অনুগত মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটদান। মৌলিক গণতন্ত্রীরা নিজেদের কায়েমী স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পুনরায় আইয়ুব খানকে ভোট দেন। তাছাড়া আইয়ুব খান নির্বাচনে দুর্নীতি ও অসাধুতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হননি। সরকারি প্রশাসনযন্ত্রও তার পক্ষে কাজ করে। ফলে সহজেই দ্বিতীয়বারের মতো তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

৫.৩ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন

১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে জাতীয় পরিষদ এবং মে মাসে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের সময়সূচি ধার্য করা হয়। প্রহসনের নির্বাচনে অংশ্রগহণের প্রশ্নে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য হলেও শেষ পর্যন্ত কপ ও এন.ডি.এফ. নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারি ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৫.৪ নির্বাচনের ফলাফল

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল ও সরকারি দলের সম্পূর্ণ অনুকূলে যায়। নির্বাচনে অবৈধ প্রভাব এবং প্রশাসনিকযন্ত্রকে ব্যবহার করে আইয়ুব খান নির্বাচনী ফলাফলের চাকা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেন। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে কপ ১০ টি, এন.ডি.এফ ৫ টি এবং স্বতন্ত্র ৬ টি আসন লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদের মোট ১৪৯ টি আসনের মধ্যে সরকারি দল কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৬৬ টি, বিরোধী দল ২৫ টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৫৮ টি আসন লাভ করে। অবশ্য সরকার পরে নানা প্রলোভনে স্বতন্ত্রদের দলে ভিড়িয়ে নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখে। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এ নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখতে পারিন।

৫.৫ ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সূচনা। মূলত কাশ্মীর সমস্যা দুদেশের মধ্যে বহুদিনের একটি অমীমাংসিত সমস্যা। এ সমস্যার উদ্ভব দেশ বিভাগ হতে। জাতিসংঘ গণভোটের মাধ্যমে সমস্যাটির নিস্পত্তি চাইলেও ভারতের অনীহার কারণে তা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় উভয় দেশ কাশ্মীরকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দাবি করতে থাকে। ১৯৪৮ সালে কাশ্মীর নিয়ে দুদেশের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ হয়। ১৯৬৫ সালে ভারত অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলে পাকিস্তান অনুপ্রবেশকারী তৎপরতা বৃদ্ধির অভিযোগকে কেন্দ্র করে দু দেশের মধ্যকার বিরোধ অত্যাধিক ও মারাত্মক আকার ধারণ করে। সেপ্টেম্বর মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

৫.৬ যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে লাহোরের দিকে অগ্রসর হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। স্থল ও বিমান যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর বাঙালি সৈন্যরা অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। তাদের সাহসিকতা ও প্রতিরোধের কারণে ভারত লাহোর দখলে ব্যর্থ হয়। এ যুদ্ধ মাত্র সতের দিন স্থায়ী হয়েছিল।

৫.৭ যুদ্ধ বিরতি ও তাসখন্দ চুক্তি

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে ২৩ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয়। অতঃপর সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মি. কোসিগিনের আমন্ত্রণে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে আলোচনা অনুযায়ী ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিটি ইতিহাসে 'তাসখন্দ চুক্তি' নামে পরিচিত। এ চুক্তি অনুযায়ী দু দেশের বিরোধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। তবে মজার ব্যাপার এই যে, এ চুক্তিতে কাশ্মীর সম্পর্কিত কোন বক্তব্য ছিল না।

৫.৮ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া

পাক-ভারত যুদ্ধ ও তাসখন্দ ঘোষণা আইয়ুবী শাসনের রাজনৈতিক ভাগ্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আইয়ুব খানের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পায়। কাশ্মীর সংক্রান্ত কোন বক্তব্য না থাকায় জনগণ তাসখন্দ চুক্তিকে অপমানজনক চুক্তি বলে গণ্য করে। তাসখন্দ চুক্তির প্রতিবাদে ছাত্র ও রাজনীতিকরা শহরাঞ্চলে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলন দমন করার জন্য অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়।

৫.৯ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া

পাক-ভারত যুদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি সৈনিকদের বীরত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে। এ যুদ্ধের সময় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক অসহায়ত্বের প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। যুদ্ধকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় পূর্ব পাকিস্তান একেবারেই অরক্ষিত হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার তাদের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই তারা নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তদুপরি যুদ্ধজনিত কারণে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে অহেতুক চাপ তাদের আইয়ুব বিরোধী মনোভাবকে আরো চাঙ্গা করে।

সার-সংক্ষেপ

১৯৬২ সালের সংবিধান ঘোষণার পর আইয়ুব বিরোধী প্রচণ্ড ছাত্র ও গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ সম্মিলিত জোট গঠনের মাধ্যমে প্রতিটি নির্বাচনে আইয়ুব খান ও তার দলকে মোকাবিলা করেন। অবশ্য আইয়ুব খান অবৈধভাবে সরকারি প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি নির্বাচনেই বিজয়ী হন। নির্বাচনের পরপরই কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাত্র ১৭ দিন যুদ্ধের পর জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতি এবং রাশিয়ার উদ্যোগে তাসখন্দে দু দেশের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি হয়। তবে এ যুদ্ধ আইয়ুব খানের রাজনৈতিক জীবনে বড় রকমের আঘাত হানে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৫

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. সম্মিলিত বিরোধী দল ‘কপ’ গঠিত হয়েছিল—
   ক. ৪ টি বিরোধী দল সমন্বয়ে   খ. ৭ টি বিরোধী দল সমন্বয়ে
   গ. ৫ টি বিরোধী দল সমন্বয়ে   ঘ. ৬ টি বিরোধী দল সমন্বয়ে

২. ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল—
   ক. ১৭ মাস   খ. ১৭ দিন
   গ. ২০ দিন   ঘ. ২ মাস

৩. তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—
   ক. পাকিস্তান-রাশিয়ার মধ্যে   খ. ভারত-রাশিয়ার মধ্যে
   গ. পাক-ভারতের মধ্যে   ঘ. ভারত-বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দল _____ প্রার্থী করে।
২. ____ সামস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ হয়।

গ. সত্য হলে ‘স’ এবং মিথ্যা হলে ‘মি’ লিখুন

১. ১৯৬৫ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে সরকারি দল ২০ টি আসন লাভ করেছিল।
২. তাসখন্দ চুক্তিতে ভারতের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্বাক্ষর করেন।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ‘কপ’ প্রার্থীর নাম কি?
২. কোন চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৬ : বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ বাংলার (পূর্ব পাকিস্তানের) প্রতি পাকিস্তানি শাসকগণের বৈষম্যমূলক আচরণ বর্ণনা করতে পারবেন।

☞ বাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তানিদের বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া কতটুকু হয়েছিল, তা আলোচনা করতে পারবেন।

৬.১ বৈষম্যমূলক নীতি

প্রথম থেকেই বাংলার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের নীতি ছিল বৈষম্যমূলক। পাকিস্তানের জন্ম থেকে পরবর্তী সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই তা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য অস্বীকার করে ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার প্রাপ্য ন্যায্য অধিকারের দিকে মোটেও দৃষ্টি দেয় নি। বরং রাজনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমাগত ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসকদের গৃহীত বৈষম্যমূলক নীতির একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

ক. রাজনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের অব্যাবহিত পর থেকেই পূর্ব বাংলা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও স্বাধিকারের প্রশ্নে পূর্ব বাংলা ক্রমাগত উপেক্ষিত হতে থাকে। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে পূর্ব বাংলার সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী উভয় পদেই নিয়োগ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান হতে। সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবিকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানের রাজধানীও প্রতিষ্ঠা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে। পরে আইয়ুব খান রাজধানী ইসলামাবাদে স্থানান্তর করেন। পশ্চিম পাকিস্তানিরাই ছিল প্রকৃত অর্থে শাসন ক্ষমতার কর্ণধার। পূর্ব বাংলার জননেতা এ.কে. ফজলুল হকসহ এ অঞ্চলের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এমনকি সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও আইন পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যাসাম্য নীতি মানতে বাধ্য করা হয়। পাকিস্তানি শাসকদের এসব বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে যখন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবি তোলে, তখন শাসক চক্র অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। এমনকি তারা এ অঞ্চলের দেশপ্রেমিক জননেতাদের দেশদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলাকারী আখ্যা দিতেও কণ্ঠাবোধ করেনি।

খ. সামরিক বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তান ছিল ভৌগোলিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা এর নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন নিশ্চিত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। শুধু তাই নয়, এসময় দু অঞ্চলের মধ্যে সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল সীমাহীন। পাকিস্তানের দেশ রক্ষা বাহিনীর তিনিটি সদর দফতরই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। একমাত্র সমরাস্ত্র কারখানাটিও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। দেশ রক্ষা বাহিনীর উচ্চপদে বাঙালিদের কোন স্থান ছিল না। দেশ রক্ষা বাহিনীতে চাকরির ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের স্থান ছিল একচেটিয়া। নিম্নের সারণি হতে এর একটি চিত্র পাওয়া যাবে -

	বিভাগ	পশ্চিম-পাকিস্তান	পূর্ব-পাকিস্তান
১.	স্থল বাহিনী	৯৫%	৫%
২.	নৌ বাহিনী (কারিগরি)	৮১%	১৯%
৩.	নৌ বাহিনী (অকারিগরি)	৯১%	৯%
৪.	বিমান বাহিনীর বৈমানিক	৯১%	৯%
৫.	সশস্ত্র বাহিনী (সংখ্যায়)	৫০০,০০০	২০,০০০

পাকিস্তানে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ছিল সর্বোচ্চ। কিন্তু এর তেমন কোন সুফল পূর্ব পাকিস্তানিরা ভোগ করতে পারেনি। প্রতিরক্ষা ব্যয়ের সিংহভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। পূর্ব পাকিস্তান ছিল সামরিক দিক হতে অবহেলিত, উপেক্ষিত ও অরক্ষিত। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় সকলেই এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারে।

গ. অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান মারাত্মক অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আয়তনে বড় হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল অনুর্বর ও মরুময়। সেজন্য এখানে কোন কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা ছিল

না। শিল্প-কারখানাও তেমন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে আর্থিক দিক থেকে প্রথম দিকে পশ্চিম পাকিস্তান ছিল দুর্বল। অন্য দিকে পূর্ব বাংলা ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এজন্য এর অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বৈষম্যের কারণে পূর্ব বাংলার জনগণ এ সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়। পাকিস্তানের মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অর্জিত হতো পূর্ব বাংলা থেকে। অথচ এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় হতো এ অঞ্চলে। মোট রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ বাংলার পণ্য থেকে অর্জিত হলেও বাংলা আমদানি পণ্যের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ পেত। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের হলেও জাতীয় আয়ের মাত্র ২৭ ভাগ ব্যয় হতো এদের জন্য। স্টেট ব্যাংকসহ প্রায় সকল ব্যাংক, বীমা, বাণিজ্য, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিদেশী মিশনসমূহের সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়। ফলে এ অঞ্চল হতে অবাধে অর্থ পাচার সম্ভব হয়।

শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও বড় বড় সকল শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে যে কয়টি শিল্প-কারাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারও মালিকানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। সেবা ও উন্নয়ন খাতেও বৈষম্য ছিল সুস্পষ্ট।

সেবা ও উন্নয়ন খাতে বৈষম্যের চিত্র নিচের দুটি সারণি হতে পাওয়া যাবে

	খাত	**পশ্চিম পাকিস্তান**	**পূর্ব পাকিস্তান**
১.	জনসংখ্যা	৫ কোটি ৫০ লাখ	৭ কোটি ৫০ লাখ
২.	ডাক্তারের সংখ্যা	১২,৪০০	৭,৬০০
৩.	হাসপাতালের বেড সংখ্যা	১৬,০০০	৬,০০০
৪.	পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৩২৫	৮৮
৫.	শহর সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র	৮১	৫২

উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ

বিষয়	**পশ্চিম পাকিস্তান**	**পূর্ব-পাকিস্তান**
বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা	৮০%	২০%
বৈদেশিক সাহায্য (মার্কিন সাহায্য ছাড়া)	৯৬%	৪%
মার্কিন সাহায্য	৬৬%	৩৪%
পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন	৫৮%	৪২%
শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন	৮০%	২০%
শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক	৭৬%	২৪%
গৃহ নির্মাণ	৮৮%	১২%

১৯৫৮-৫৯ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু গড় আয় ছিল পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা শতকরা ৩২ ভাগ বেশি ১৯৬৯-৭০ সালে মোট দাঁড়ায় শতকরা ৬১ ভাগে।

ঘ. শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রেও বেদনাদায়েক বৈষম্য দেখা যায়। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পায়। অথচ একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংখ্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বিগুণ। ২০ বছরে এখানে ৫ গুণ ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানে বৃদ্ধি পায় ৩০ গুণ। কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩ এবং পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৩ টি গবেষণা কেন্দ্র তৈরি করা হয়। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন বৃত্তির সিংহভাগ সুবিধা পায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা।

চাকরির ক্ষেত্রেও যে বৈষম্য ছিল এর উদাহরণ নিম্নোক্ত সারণি

দফতর	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
কেন্দ্রীয় বেসামরিক দফতর	৮৪%	১৬%
বৈদেশিক দফতর	৮৫%	১৫%
বিদেশী মিশনের প্রধান কর্মকর্তা	৬০%	৯%
পাকিস্তান এয়ারলাইন্স (সংখ্যায়)	৭০০০	২৮০

এমনিভাবে পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনা থেকেই পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) শোষণ, বঞ্চনা ও নানা বৈষম্যের শিকার হতে থাকে।

৬.২ বৈষম্য নীতির প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এরূপ নির্লজ্জ বৈষম্য নীতি স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। পাকিস্তানিদের ব্যাপক রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ও শোষণ নীতির প্রতিবাদে এ অঞ্চলের জনগণ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় আইয়ুব খান তাঁর উন্নয়ন দশক উদ্‌যাপন করলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একে প্রহসন হিসেবে গ্রহণ করে এবং স্বাধিকার অর্জনের জন্য গণ-আন্দোলনের শুরু করে। যার পরিণাম আইয়ুবের পতন এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জন এবং বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়।

সার-সংক্ষেপ

ভৌগোলিক অবাস্তবতা ও কৃষ্টি কালচারের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ন্যায্য অধিকার লাভের আশায় পূর্ব বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু শুরু থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার প্রতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। ফলে পূর্ব বাংলা একটি পশ্চাদপদ এলাকায় পরিণত হয়। পূর্ব বাংলার জনমানুষের কাছে এ বৈষম্যের চিত্র সুস্পষ্ট হওয়ায় তীব্র প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। স্বাধিকার অর্জনের জন্য সূচিত হয় গণ-আন্দোলনের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৬

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী ছিল—

ক. লাহোর খ. করাচী

গ. রাওয়ালপিন্ডি ঘ. ইসলামাবাদ

২. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পাকিস্তানের মোট জাতীয় আয় থেকে ব্যয় করা হতো—

ক. ৫০ ভাগ খ. ৬০ ভাগ

গ. ৩০ ভাগ ঘ. ২৭ ভাগ

৩. ১৯৬৯-৭০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের গড় মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে বেশি ছিল—

ক. শতকরা ৩২ ভাগ বেশি খ. শতকরা ৬১ ভাগ বেশি

গ. শতকরা ২৫ ভাগ বেশি ঘ. শতকরা ৬০ ভাগ বেশি

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দপ্তরই ছিল _____ ।

২. আয়তনে বড় হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল _____ ও _____ ।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানিদের ন্যায্য অধিকারের ব্যাপারে শুরু থেকেই খুবই সহানুভূতিশীল ছিল।

২. দেশ রক্ষা বাহিনীর সর্বোচ্চ পদে বাঙালিদের কোন স্থান ছিল না।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. কে পাকিস্তানের রাজধানী করাচী থেকে ইসলামাবাদ স্থানান্তর করেন?

২. পাকিস্তানের মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা কত ভাগ পূর্ব বাংলা থেকে অর্জিত হতো।

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের সামরিক বৈষম্যের একটি চিত্র দিন।

২. পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল, তার বিবরণ দিন।

৩. পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।

পাঠ-৭ : ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- ☞ যে পরিস্থিতি ১৯৬৬ সালে ৬ দফা পেশ করা হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ ছয় দফা দাবি সম্পর্কে আলোচনা করতে পরবেন।
- ☞ ছয় দফার তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৬৬ সালের 'ছয় দফা' আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত এ ছয় দফা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের 'মুক্তির সনদ'।

৭.১ ছয় দফা পেশের পটভূমি

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ এবং বিশেষ করে তৎপরবর্তী 'তাসখন্দ ঘোষণাপত্র' কেবল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নয় পশ্চিম পাকিস্তানেও জনমতের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদগণ এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৯৬৬ সালে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে 'নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স' আহবান করেন। সম্মেলনে প্রায় ৭০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তবে এতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল মাত্র ২১ জন। তারা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দাবি সংবলিত একটি 'ছয় দফা প্রস্তাব' উত্থাপনের চেষ্টা করেন । কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের বিরোধিতায় তিনি ব্যর্থ হন। অবশেষে লাহোরে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর কর্মসূচি প্রকাশ করেন। 'ছয় দফা' ভিত্তিক এ কর্মসূচি ইতিহাসে 'ঐতিহাসিক ছয় দফা' নামে পরিচিত। ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং ১৯ মার্চ কাউন্সিল অধিবেশনে 'ছয় দফা' কর্মসূচি অনুমোদন লাভ করে।

৭.২ ছয় দফা কর্মসূচি

১. **শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি :** ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য সত্যিকার অর্থে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। এর সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আইন সভাগুলো আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে। সংবিধানে জনগণের পূর্ণ মৌলিক অধিকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদত্ত হবে।

২. **কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা :** কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেবল প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে।

৩. **মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থা :** পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সহজ ও অবাধ বিনিময়যোগ্য পৃথক মুদ্রা থাকবে অথবা ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই প্রদেশে দুটি রির্জাভ ব্যাংকসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু থাকবে।

৪. **রাজস্ব, কর, শুল্ক ব্যবস্থা :** সকল প্রকার কর ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে। আদায়কৃত রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা দেওয়া হবে।

৫. **বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্য :** দু'অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা হিসাব থাকবে। প্রয়োজনে দু'অঞ্চল থেকে সমান হারে অথবা সংবিধানে নির্ধারিত হারে কেন্দ্রকে প্রদান করা হবে।

৬. **প্রতিরক্ষা :** নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী তথা মিলিশিয়া বা প্যারামিলিশিয়া গঠন করতে পারবে।

৭.৩ ছয় দফার প্রতিক্রিয়া

ছয় দফাকে মনে করা হতো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের মুক্তির সনদ। এ কর্মসূচি তাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। ফলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানায়। ক্রমশ পূর্ব পাকিস্তানে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ ছয় দফার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তারা ছয় দফার নানা অপব্যাখ্যা এবং একে জাতীয় সংহতির পরিপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করে।

৭.৪ সরকারি দমন নীতি

পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে সরকার দমন নীতি প্রয়োগ করে। গভর্নর মোনায়েম খানের নির্দেশে শেখ মুজিবসহ বহু নেতা-কর্মিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এতে পূর্ব পাকিস্তানে ভীষণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বন্দিদের মুক্তির দাবিতে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন প্রদেশব্যাপী এক সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেওয়া হয়। ঐ দিন সরকার ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করলে কিশোর মনুমিয়াসহ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ জন নিহত ও শত শত লোক আহত হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্যবৃন্দ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন।

৭.৫ ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি সর্বক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি করে, ছয় দফা কর্মসূচি ছিল তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবি ছিল না, বরং এটি ছিল বৈষম্যের প্রতিকার ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবি। কিন্তু সরকারের নানারূপ অপব্যাখ্যা, দমন-নিপীড়নমূলক নীতি পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সংগ্রামী রূপ দান করে। এ সংগ্রামী চেতনার ফসল '৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান এবং ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ছয় দফার গুরুত্ব অপরিসীম।

৭.৬ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সরকারি দমন-নির্যাতন সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমশ আন্দোলন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় সরকার ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার একটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে। শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিকে মামলাভুক্ত করা হয়। এ মামলাটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। মামলার অভিযোগে বলা হয় যে, আসামিগণ ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভারতের আগরতলায় ষড়যন্ত্র করেছিল। শেখ মুজিবসহ অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকায় একটি বিশেষ ট্রাইবুন্যাল আদালত গঠন করে বিচার কার্য শুরু করা হয়। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি এম. আর. খান এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। প্রধান আসামি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ১৬টি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। মামলা চলাকালে রাজসাক্ষীদের অনেকে গোপন কথা ফাঁস করে দেন এবং তাদের জোরপূর্বক সাক্ষ্য দিতে বলা হয়েছে বলে স্বীকার করেন। একদিকে সাক্ষীদের মিথ্যা বলতে অনীহা, আসামিদের জোরালো প্রতিবাদের কারণে বিচার প্রক্রিয়া শিথীল হয়ে পড়ে।

৭.৭ মামলা প্রত্যাহার

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পূর্ব পাকিস্তানের গণ-মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আসামিদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সৃষ্ট আন্দোলন আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। এসময় মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক বন্দি অবস্থায় ঢাকা সেনানিবাসে পুলিশের গুলিতে নিহত হলে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। অবশেষে আন্দোলনের মুখে সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মামলাটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে রেসকোর্স ময়দানে এক বিরাট গণসংবর্ধনা দেয়া হয় এবং ঐইদিনই তিনি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন।

৭.৮ মামলার ফলাফল ও গুরুত্ব

পাকিস্তান সরকারের পক্ষে এ মামলাটি ছিল সম্পূর্ণ নেতিবাচক। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর জন্য এ মামলার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথমত, এ মামলার পর পাকিস্তান সরকার গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। দ্বিতীয়ত, বঙ্গবন্ধু অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতায় পরিণত হন। মামলা চলাকালে তাঁর পাকিস্তানের দু'অংশের বৈষম্যের বর্ণনায় তাঁর দলের পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে। তৃতীয়ত, এই মামলার ব্যর্থতায় আইউব খানের পতন ঘটে। বাঙালির বিজয় ঘটে। চতুর্থত, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পেছনে এ মামলার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। ১৯৬৮ সালের আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে যা নির্বাচনে সক্রিয় প্রভাব ফেলে।

সার-সংক্ষেপ

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি গৃহীত নানা বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট বিক্ষুব্ধ অবস্থার পটভূমিতে ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করা হয়। ছয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ। তাই এর প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানায়। এ দফাগুলো দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এমতাবস্থায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দমন-নির্যাতনের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হয়ে শেখ মুজিবসহ বেশ কিছু সামরিক-বেসামরিক লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে। এটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মালমা নামে পরিচিত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রবল গণ-আন্দোলনের মুখে সরকার মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৭

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. ছয় দফা প্রথম উত্থাপন করা হয়—
ক. ইসলামাবাদে খ. ঢাকায়
গ. লাহোরে ঘ. করাচিতে

২. ছয় দফা দাবি উপস্থাপন করা হয়—
ক. ১৯৬২ সালে খ. ১৯৬৬ সালে
গ. ১৯৬৭ সালে ঘ. ১৯৬৯ সালে

৩. পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করে ১৯৬৮ সালের—
ক. জানুয়ারি মাসে খ. ফেব্রুয়ারি মাসে
গ. মার্চ মাসে ঘ. ডিসেম্বর মাসে

৪. আগরতলা ষড়যন্ত্র মালা প্রত্যাহার করা হয় ১৯৬৯ সালের—
ক. ২১ ফ্রেব্রুয়ারি খ. ২২ ফেব্রুয়ারি
গ. ২২ মার্চ ঘ. ২১ এপ্রিল

৫. শেখ মুজিব ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধীতে ভূষিত হন ১৯৬৮ সালের—
ক. ২২ ফেব্রুয়ারি খ. ২৪ ফেব্রুয়ারি
গ. ২৩ ফেব্রুয়ারি ঘ. ২৭ ফেব্রুয়ারি

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য একটি _____ রচনা করতে হবে।
২. ন্যাপ নেতা _____ ৬ দফার বিরোধিতা করেছিলেন।

গ. সত্য হলে ‘স’ এবং মিথ্যা হলে ‘মি’ লিখুন

১. ছয় দফায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা দাবি করা হয়।
২. শেখ মুজিব ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি।
৩. ছয় দফা মতে পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
২. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের মধ্যে কে বন্দি অবস্থায় পুলিশের হাতে নিহত হয়েছিলেন?
৩. কবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছিল?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-প্রশ্ন উত্তর

১. ছয় দফা দাবি কি?
২. ছয় দফার প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।
৩. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ-৮ : এগার দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ ছাত্র সমাজের **১১** দফা আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

☞ **১৯৬৯** সনের গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

☞ **১৯৬৯** এর গণ-অভ্যুত্থানের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৮.১ উন্নয়ন দশক পালন ও পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া

পূর্ববর্তী পাঠে এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। এ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ 'ডেমোক্রেটিক একশান কমিটি' (DAC) গঠন করে। আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ও মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করা ছিল 'ডাক' এর উদ্দেশ্য। এজন্য 'ডাক' ৮ দফা ভিত্তিক আন্দোলন শুরু করে। এসময় **১৯৬৮** সালের **২৭** অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতার দশম বার্ষিকী উপলক্ষে পাকিস্তানে 'উন্নয়ন দশক' পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ কর্মসূচি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শোষণ-বঞ্চনা ও ষড়যন্ত্রের শিকার পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। তারা আইয়ুবী স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে।

৮.২ সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন

আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন ছাত্র সমাজ এসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। **১৯৬৯** সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের মস্কো ও পিকিংপন্থী দুটি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (এন.এস.এফ) একাংশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে।

৮.৩ এগার দফা কর্মসূচি

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ **১১** দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে। **১৪** জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এক সাধারণ ছাত্র সভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে **১১** দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। **১১** দফা কর্মসূচিতে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত ৬ দফা কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। **১১** দফা দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিনেন্স বাতিলসহ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, ব্যাংক ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, কৃষকদের খাজনা ও ট্যাক্স হ্রাস, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত, সকল বিবর্তনমূলক আইন বাতিল এবং বন্দিদের মুক্তি ও সকল মামলা প্রত্যাহার।

৮.৪ এগার দফা ভিত্তিক আন্দোলন

ছাত্রদের **১১** দফা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। **১১** দফা আদায়ের দাবিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ **১৯৬৯** সালের **১৮** জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। সরকার ইতোমধ্যেই শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে **১৪৪** ধারা জারি করেছিল। **১৮** জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশ শেষে **১৪৪** ধারা ভঙ্গ করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। পুলিশ ও ই. পি. আর (বর্তমান বি ডি আর) ছাত্রদের নির্মমভাবে নির্যাতন ও বেশ কিছু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে **১৯** জানুয়ারি ধর্মঘট, ছাত্রসভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। **২০** জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়।

৮.৫ আসাদের মৃত্যু ও গণ-অভ্যুত্থান

২০ জানুয়ারি ছাত্র সমাবেশে হাজার হাজার ছাত্র যোগদান করে। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল পুলিশী বাধা উপেক্ষা করে শহীদ মিনারের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ-ই.পি.আর বাহিনীর সাথে তাদের সংঘর্ষ বাধে। এক পর্যায়ে পুলিশ বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার উপর গুলি চালালে ঢাকা সেন্ট্রাল 'ল' কলেজের ছাত্র আসাদুজ্জামানসহ আরো তিনজন নিহত হয়। এ ঘটনা জ্বলন্ত বারুদে অগ্নিসংযোগ করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে **২১** জানুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত শহীদদের গায়বানা জানাজা শেষে **২২, ২৩** ও **২৪** জানুয়ারি শোক কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। প্রথম দু'দিন ধর্মঘট ও বিক্ষোভ এবং শেষ দিন প্রদেশব্যাপী হরতালের ডাক দেওয়া হয়। **২৪** তারিখের হরতালের দিনটি গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে আসে। এদিন উত্তেজিত ছাত্র-জনতা সচিবালয় ভবন আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগ করলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে নবকুমার

ইনস্টিটিউটের ছাত্র মতিউর রহমানসহ কয়েকজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়। ফলে বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করে। শহীদ মতিউরের লাশ নিয়ে উত্তেজিত জনতা বিশাল শোভাযাত্রা বের করে। এসময় প্রবল জনরোষে আক্রান্ত হয় সরকার সমর্থক 'দৈনিক পাকিস্তান' ও 'ডেইলি মর্নিং নিউজ' পত্রিকা অফিস। সরকার কারফিউ জারির মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। তবে সান্ধ্য আইন গণ-অভ্যুত্থানকে দমন করতে পারেনি। বরং সারা দেশে দ্রুত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানেও এ আন্দোলনের ঢেউ লাগে। একনায়কতন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, পেশোয়ার ও করাচী থেকে শুরু হয়ে আন্দোলন ক্রমশ পশ্চিম পাকিস্তানের মফস্বল এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে।

৮.৬ আলোচনার প্রস্তাব ও পরবর্তী পরিস্থিতি

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যখন গণবিদ্রোহের জোয়ারে উত্তাল তখন ১৯৬৯ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিরোধী রাজনীতিবিদদের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু মাওলানা ভাসানী বৈঠকে যোগদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য যে গণ-অভ্যুত্থানে ভাসানীও নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় ছিলেন। কারাগারে আটক শেখ মুজিবুর রহমান প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে ১৭ ফেব্রুয়ারি বৈঠক অনুষ্ঠানে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এতে গণ-আন্দোলন আরো তীব্র হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি সাধারণ হরতাল পালিত এবং বিকেলে পল্টন ময়দানে বিশাল ছাত্র ও গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে আটক আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনীর গুলিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহার মৃত্যুতে সারাদেশে আন্দোলনের দাবানল জ্বলে ওঠে।

৮.৭ আইয়ুব খানের নতি স্বীকার

প্রবল গণ-বিদ্রোহের মুখে আইয়ুব খান নতি স্বীকারে বাধ্য হন। আন্দোলন প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে জরুরি অবস্থা উঠিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ বন্দিদের মুক্তি দেয়া হয়। একই সাথে তিনি আর প্রেসিডেন্ট প্রার্থী না হওয়ারও ঘোষণা দেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি কারামুক্ত শেখ মুজিবকে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সংবর্ধনা দেয়া হয়। সংবর্ধনা সভায় ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

৮.৮ গোল টেবিল বৈঠক

কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষে সরকারের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন ৪০ মিনিট আলোচনার পর ১০ মার্চ পর্যন্ত বৈঠক মুলতবি করা হয়। ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত বৈঠকে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন এবং সংসদীয় সরকার প্রবর্তনের দাবি মেনে নিলেও বঙ্গবন্ধুর স্বায়ত্তশাসনের দাবি অগ্রাহ্য করেন। ফলে বৈঠক ব্যর্থ হয়।

৮.৯ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পদত্যাগ

গোল টেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার পর পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। এমতাবস্থায় ক্ষমতা রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে আইয়ুব খান গণ-ধিকৃত মোনায়েম খানকে বরখাস্ত করে অর্থমন্ত্রী ড.এম.এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। বরং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। সমগ্র পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এ অবস্থায় উপায়ন্তর না দেখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সেনাপ্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে প্রচণ্ড গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের এক দশকের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে।

সার-সংক্ষেপ

বাংলার ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের এগার দফা ও গণ-অভ্যুত্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের

স্বৈরশাসনে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা স্বৈরশাসনের অবসান, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য ৬ দফা ও এগার দফা ভিত্তিক আন্দোলন শুরু করে। কালক্রমে এ আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এ গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুব শাসনের অবসান ঘটে। গণ-অভ্যুত্থানে পূর্ব পাকিস্তানিদের এ সাফল্য পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৮

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. আইয়ুব খান 'উন্নয়ন দশক' পালন করেন—

ক. ১৯৬৬ সালে খ. ১৯৬৮ সালে
গ. ১৯৬৯ সালে ঘ. ১৯৬৭ সালে

২. এগার দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে—

ক. ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি খ. পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
খ. সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘ. পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ

৩. আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন—

ক. ১৮ জানুয়ারি খ. ২০ জানুয়ারি
গ. ১৮ ফেব্রুয়ারি ঘ. ২১ ফেব্রুয়ারি

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে সর্বদলীয় _____ পরিষদ গঠিত হয়।
২. পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ______ গোল টেবিল বৈঠক আনুষ্ঠিত হয়।
৩. আইয়ুব খান _____ সালে ______ মার্চ ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়।
২. রাওয়ালপিন্ডির গোল টেবিল বৈঠকে আইয়ুব খান স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেন।
৩. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. গণ-আন্দোলনে শহীদ আসাদ কে ছিলেন?
২. ১৮৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নিহত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের নাম কি?
৩. মোনায়েম খানকে বরখাস্ত করে কাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিল?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. এগার দফা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. সংক্ষেপে গণ-অভ্যুত্থানের বর্ণনা দিন।
৩. গণ-অভ্যুত্থানের ফলাফল আলোচনা করুন ।

পাঠ-৯ : ইয়াহিয়া খানের শাসন ও ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ☞ ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা লাভ ও তাঁর গৃহীত কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও এর ফালাফল আলোচনা করতে পারবেন।

৯.১ ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা লাভ ও সামরিক শাসন জারি

পূর্ববর্তী পাঠে আপনারা জেনেছেন যে, ১৯৬৯ সালের প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসেই দেশে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষিত হয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। ২৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে তিনি অল্পকালের মধ্যে দেশে একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠন এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দেন।

৯.২ নির্বাচনের ঘোষণা

জেনারেল ইয়াহিয়ার ২৬ মার্চ এর ভাষণের উদ্দেশ্য সৎ মনে হলেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এতে সংশয় প্রকাশ করেন। তারা অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি জানান। অবশেষে ক্ষমতা গ্রহণের ৮ মাস পর ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই ঘোষণায় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এক ইউনিট প্রথা বাতিল করে ইতঃপূর্বে অবলুপ্ত ৪টি প্রদেশ পুনর্বহাল করেন। ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে হতে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালুর অনুমতি দেয়া হয়।

৯.৩ আইন কাঠামো আদেশ ও এর প্রতিক্রিয়া

১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ ইয়াহিয়া খান 'আইন কাঠামো আদেশ' জারি করেন। এই আদেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের গঠন প্রণালী ও নির্বাচন বিষয়ক বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ আদেশে 'এক ব্যক্তির এক ভোট' নীতিতে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করা হয়। জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ৩১৩ (১৩টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ)। আদেশে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদ প্রথম অধিবেশনের দিন হতে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করবে। যদি তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। সংবিধান সংক্রান্ত বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হলেও পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে।

আইন কাঠামো আদেশের প্রতি রাজনৈতিক দলসমূহ বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ভাসানী ন্যাপ ও ন্যাশনাল লীগ নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এই আদেশের বিরূপ সমালোচনা করলেও পাকিস্তানের ১১টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণে সম্মত হয়। আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনকে ৬ দফা ও ১১ দফার বিষয়ে রেফারেন্ডাম হিসেবে অভিহিত করে।

৯.৪ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত থাকলেও বন্যাজনিত কারণে তা পরিবর্তন করা হয়। ৭ ডিসেম্বর জাতীয় এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। তবে নির্বাচনের প্রাক্কালে ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। ভয়াবহ গোর্কী ও জলোচ্ছ্বাসে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আনুমানিক ১০/১৫ লক্ষ লোক এতে নিহত হয়। ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর যথাক্রমে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলের জাতীয় পরিষদের ৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি আসনে এক মাস পর ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৯.৫ নির্বাচনের ফলাফল

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অন্য দুটি আসনে নির্বাচিত হন পি.ডি.পি প্রধান জনাব নূরুল আমিন ও রাজা ত্রিবিদ রায়। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে সংরক্ষিত ১০টি মহিলা আসনসহ আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন লাভ করে। বাকি আসনগুলোর ২টি পি.ডি.পি, ১টি নেজাম-ই- ইসলামী, ১টি জামায়াতে ইসলামী, ১টি ন্যাপ (মস্কো) ও ৭টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়লাভ করে। অন্যদিকে জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৪৪টি আসনের মধ্যে জুলফিকার আলী ভূট্টোর নেতৃতাধীন ''পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি'' ৮৮টি আসন লাভ করে। উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পিপলস্ পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন পায়নি।

৯.৬ নির্বাচনের গুরুত্ব

১. **বাঙালি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয় :** ১৯৪৭ সালের পর থেকে বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্যবাদ দাবি করেছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে এর বিজয় হয়।

২. **স্বায়ত্তশাসনের বৈধতা প্রমাণ :** নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের বৈধতা প্রমাণ করে।

৩. **বাঙালি জাতীয়তাবাদের জয় :** ১৯৫২ সাল থেকে ভাষাভিত্তিক যে জাতীয়তাবাদের সূচনা হয় তা নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে সুদৃঢ় হয়।

৪. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রভাব

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। এ সাফল্যে পূর্ব পাকিস্তানে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আওয়ামী লীগ ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি বিজয় দিবস পালন করে। এ দিন রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল সমাবেশে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ ৬ দফা বাস্তবায়নে প্রকাশ্য শপথ গ্রহণ করে ।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এ সাফল্যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী শংকিত হয়ে পড়ে । তারা জনগণের রায়কে বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সংবিধান প্রণয়ন প্রশ্নে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির জুলফিকার আলী ভূট্টোর মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা দেয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খানও নানা অজুহাতে জাতীয় পরিষদ আহবানে টালবাহানা শুরু করেন। আওয়ামী লীগের চাপে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন । কিন্তু ১ মার্চ আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এর ফলে ঢাকাসহ সারা প্রদেশে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, যা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনা করে।

সার-সংক্ষেপ

পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হাস্তান্তরে বাধ্য হন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা লাভ করেই পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন। সংবিধান বাতিল এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। অবশ্য রাজনৈতিক দলসমূহের দাবিতে শেষ পর্যন্ত তিনি সাধারণ নির্বাচন দেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রদেশিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক দল হিসেবে সারা পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু সরকার নির্বাচনের রায় বানচালে ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করলে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। যা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৯

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসে সামরিক আইন জারি করেন—

ক. ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ

খ. ১৯৭০ সালের ২৫ মার্চ

গ. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ

ঘ. ১৯৭০ সালের ২৬ মার্চ

২. আইন কাঠামো আদেশ জারি করেন—

ক. প্রেসিডিন্ট আইয়ুব খান

খ. জেনারেল ইয়াহিয়া খান

গ. জুলফিকার আলী ভূট্টো

ঘ. টিক্কা খান

৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে আসন পেয়েছিল—

ক. ১৬৭ টি

খ. ১৬৬ টি

গ. ১৬৮ টি

ঘ. ১৬৯ টি

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসেই পুনরায় দেশে _______ জারি করেন।

২. ১৯৭০ সালের _____ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ ও ______ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি _______ টি আসন লাভ করে।

গ. এক কথায় উত্তর দিন

১. আইন কাঠামো আদেশ অনুযায়ী পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আসন সংখ্যা কত নির্ধারণ করা হয়েছিল?

২. ১৯৭০ সালের নির্বাচন বর্জনকারী একটি রাজনৈতিক দলের নাম লিখুন।

৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ কয়টি আসন লাভ করেছিল?

ঘ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আইন কাঠামো আদেশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল আলোচনা করুন।

৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

৪. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রভাব লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১৫

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি আলোচনা করুন। এ আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিরূপণ করুন।
২. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি কি ছিল? এ নির্বাচনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৩. জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতায় আরোহণের পটভূমি বর্ণনা করুন। মৌলিক গণতন্ত্রসহ ক্ষমতায় থাকার জন্য তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪. পাকিস্তান আমলে বাংলার প্রতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরুন।
৫. ছয় দফা কর্মসূচি কি? এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৬. ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের বিবরণ দিন।
৭. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পটভূমি ও এর ফলাফল আলোচনা করুন।